ইউনিট ৬

বাংলাদেশে প্রচলিত প্রধান প্রধান সামাজিক আইনসমূহ

পাঠ- ১ ঃ সামাজিক আইনের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ সামাজিক আইন বলতে কি বুঝায়;
- ☞ সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব;
- ☞ সামাজিক আইনের ক্ষেত্রসমূহ।

ভূমিকা

সমাজের মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্যে রাষ্ট্র কর্তৃক কিছু নিয়ম-নীতি গ্রহন করা হয়; যা ভঙ্গ করলে শাস্তি ভোগ করতে হয় এই সব যা ভঙ্গ করলে শাস্তি ভোগ করতে হয় এই নিয়ম কানুন বা রীতি-নীতিকেই আইন বলা হয়। আইন বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে যেমন-সামাজিক আইন, প্রাকৃতিক আইন, ফৌজদারি আইন, প্রশাসনিক আইন ও জরুরি আইন ইত্যাদি। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সামাজিক আইন কি এবং এর উদ্দেশ্য কি কি? এ সমাজে এর প্রয়োজনীয়তা কেন?

৬.১ সামাজিক আইন বলতে কি বুঝায়?

সামাজিক আইনের সংজ্ঞা

সামাজিক আইন বলতে সাধারনত সার্বভোম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ও সমাজ র্কতৃক স্বীকৃত সে সব নিয়ম কাননুনের সমষ্টিকে বুঝায়; যা সমাজে প্রচলিত অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর অবস্থা প্রতিকার ও প্রতিরোধ অবহেলিত শ্রেণীর স্বার্থ উদ্ধার, দৈব-দুর্যোগ মোকাবেলা ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।

সমাজকল্যাণ অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী "অবেহেলিত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও সেবাদানের জন্য অথবা সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা শারীরিক পঙ্গু, দরিদ্র বা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসুবিধার জন্যে সন্তোষজনক জীবন-যাপনে অক্ষম, তাদের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে সেবামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করার জন্য প্রবর্তিত আইনই সামাজিক আইন। ভারতীয় সমাজকর্ম বিশ্বকোষের মতে- "যথাযথ আইন সিদ্ধ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গৃহীত সামাজিক প্রথার সংশোধনকে সামাজিক আইন বলা যেতে পারে।"

সুতরাং সামাজিক আইন হচ্ছে- সমাজে বিভিন্ন অব্যবস্থা দূরীকরণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও প্রবর্তিত রীতি-নীতির সমষ্টি। সামাজিক আইনের মাধ্যমে সমাজ দেহের ক্ষতিকর প্রথা রীতি-নীতি মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করে থাকে। সামাজিক আইন হলো সমাজস্থ মানুষের স্থায়ী আচার-আচরণ ব্যবহার ও চিন্তাধারার সেই অংশ; যা সাধারণ নিয়মাবলী হিসেবে সামজে সুস্পষ্ট ও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং যার পশ্চাতে সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বর্তমান। সামাজিক আইনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

(ক) সামাজিক আইন হলো কতগুলো বিধিবদ্ধ আচার-ব্যবহার, সুনির্দিষ্ট, সার্বজনিন ও সব কিছুর উর্ধ্বে;

(খ) সামাজিক আইন মানুষের কেবল বর্হিজীবনের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে;

(গ) সামাজিক স্থিতিশীলতা অধিকার বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণ, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবধিকার প্রতিষ্ঠা সামাজিক আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য;

(ঘ) রীতিসিদ্ধ প্রথার উন্নয়ন ও কুপ্রথার বিলোপ সাধনের জন্যে সামাজিক আইন সহায়তা করে;

(ঙ) সমাজ সংস্কার ও পরিকল্পিত পরিবর্তনে আনয়নে সহায়তা প্রদান ও সামাজিক আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য;

(চ) সামাজিক আইন গতিশীল ও দেশ কালভেদে পরিবর্তনশীল।

৬.২ সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

সামাজস্থ মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ, অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণএবং প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে বাঞ্চিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি এবং সামাজিক অগ্রগতি ও কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্য সামাজিক আইন লক্ষ্য ও গুরুত্ব অপরিসীম।

নিম্নে সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব আলোচনা করা হলো-

১) **সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ঃ** সামাজিক আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান দার্শনিক এরিষ্টটলের বলেছেন "মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী কিন্তু যখন আইন এবং ন্যায়বিচার থেকে বিছিন্ন থাকে তখন সবচেয়ে খারাপ।"

২) **অবাঞ্ছিত অবস্থা দূরকরা ঃ** সমাজে বিদ্যমান ও উদ্ভূত ক্ষতিকর, অবাঞ্চিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা রোধ করতে সামাজিক আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনই এর অন্যতম উদ্দেশ্য যেমন- সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ।

৩) **পরিকল্পিত পরিবর্তন ঃ** সমাজের অগ্রগতি সাধনের জন্য এবং অন্তরায় সৃষ্টিকারী উপাদানসূহ প্রতিরোধ কল্পে সামাজিক আইনের মাধমে পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন সাধন করা হয়।

৪) **বাঞ্ছিত কাঠামো সৃষ্টি ঃ** বাঞ্ছিত ও গতিশীল আর্থ-সামাজিক কাঠামো সৃষ্টির উদ্দেশ্য সামাজিক আইন প্রণীত হয়ে থাকে।

৫) **স্বার্থ সংরক্ষণ ঃ** জনগণের বিশেষিত অবহেলিত শ্রেণীর অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা সামাজিক আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বহন করে। যেমন-১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন এর মাধ্যমে এ দেশের অবহেলিত নারীগোষ্ঠির সার্থ সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৬) **সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ঃ** সামাজিক আইন সমাজ থেকে সর্ব প্রকার সামাজিক বৈষম্য দূর করে; সাম্য ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাছাড়া এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সুষম বন্টন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৭) **দ্বন্ধ নিরসন ঃ** আদর্শ ও মূল্যবোধজনিত দ্বন্ধ নিরসন করে সামাজিক আইন বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য প্রতিরোধ করে। শুধু তাই নয়, সামাজিক আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে আদর্শ ও মূল্যবোধ সংরক্ষণ করা।

৮) **সমস্যার প্রতিকার,** প্রতিরোধ ও উন্নয়নঃ বর্তমানে পরিস্থিতি বা সমস্যার সমাধান বা প্রতিকার এবং ভবিষ্যতে সমস্যা ও বিরূপ পরিস্থিতির প্রতিরোধ ও উন্নয়নে গুরুত্বরোপ করা সামাজিক আইনের অন্যতম লক্ষ্য। যেমন- মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন -১৯৯০ ।

৯) **সংহতি ও স্থিতিশীলতা অর্জন ঃ** সামাজিক আইন সমাজে ঐক্য, শৃংখলা, সংহতি ও স্থিতিশীলতা অর্জনও বজায় রাখতে বদ্ধ পরিকর।

১০) **সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ঃ** সামাজিক আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে- সামজ জীবনে উদ্ভূত দুর্যোগ কালীন দূর্ঘটনা, মৃত্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিশ্চিয়তা দূর করে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা। যেমন- ভবিষ্যত তহবিল আইন।

১১) **সামাজিক নীতির বাস্তবায়ন ঃ** সামাজিক নীতি বাস্তবায়নের সহায়তা প্রদান সামাজিক আইনের অন্যতম লক্ষ্য। বিভিন্ন প্রথা, কুসংস্কার, অজ্ঞতা, প্রতিবন্ধকতা, বিশৃংখলা ইত্যাদি। প্রতিরোধ করে সামাজিক আইন সামাজিক নীতি বাস্ত বায়নে অনুকুল পরিবশে সৃষ্টি করে।

সুতরাং বলা যায়, সামাজিক আইন সমাজকল্যাণ, সমাজ সংস্কার, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, অবহেলিত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ, সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা এর অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে উক্ত ক্ষেত্রসমূহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে:

সামাজিক আইনের ক্ষেত্রসমূহ

সামাজিক আইনের ক্ষেত্রসমূহ নিম্নে আলোচিত হলো-

বিবাহ ও পরিবার বিষয়ক আইনসমূহ

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন	-	১৯২৯
হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন	-	১৯৩৯
বিবাহ বিচ্ছেদ আইন	-	১৯৫৬
খৃষ্টান বিবাহ আইন	-	১৮৭২
বিশেষ বিবাহ আইন	-	১৮৭২
ভারতীয় বিবাহ বিচ্ছেদ আইন	-	১৮৭২
মুসলিম শরিয়ত আইন	-	১৯৩৭
মুসলিম পারিবারিক আইন	-	১৯৬১
পারিবারিক বিবাহ ও তালক (রেজিস্ট্রেশন) আইন	-	১৯৭৪
পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ	-	১৯৮৫

(২) নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক সামাজিক আইনসমূহ

যৌতক নিরোধ আইন	-	১৯৮০
নারী নির্যাতন অর্ডন্যান্স	-	১৯৮৩
শিশু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন	-	২০০০

(৩) নিরাপত্তা বিষয়ক সামাজিক আইনসমূহ

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন	-	১৯২৩
ভবিষ্য তহবিল আইন	-	১৯২৫
মহিলা কর্মচারীদের মাতৃত্ব সুবিধা আইন	-	১৯৩৯
চা শিল্প শ্রমিক মাতৃত্ব সুবিধা আইন	-	১৯৫০
এতিমখানা আইন	-	১৯৬৫
কারখানা ও বিধবা সদন আইন	-	১৯৪৪
কারখানা আইন	-	১৯৬৫
কারখানা বিধি	-	১৯৭৯

(৪) শ্রম সংশ্লিষ্ট ও কল্যাণ বিষয়ক সামাজিক আইনসমূহ

শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন	-	১৯২৩
প্রভিন্টে ফান্ড আইন	-	১৯২৫
শিশু (শ্রম বন্ধন) আইন	-	১৯৩৩
চা বাগান শ্রম অধ্যাদেশ আইন	-	১৯৬২
দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন	-	১৯৬৫
কারখানা আইন	-	১৯৬৫
সরকারি ও স্বায়িত্বশাসিত কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল ও গ্রুপ ইনসিওরেন্স অর্ডিন্যান্স আইন	-	১৯৮২

(৫) শিশু বিষয়ক আইনসমূহঃ

ক) শিক্ষানবীশ আইন	-	১৮৫০
খ) রিফরমেটরি স্কুল আইন	-	১৮৫৭
গ) বঙ্গীয় শিশু আইন	-	১৯২২
ঘ) কারখানা আইন	-	১৯৩৪
ঙ) প্রফেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স	-	১৯৬০
চ) শিশু আইন	-	১৯৭৪

অনুশীলনী

সম্ভাব্য উত্তর/সংক্ষেপে প্রশ্ন উত্তর

১) সামাজিক আইন বলতে কি বুঝায়? সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য গুলো/লক্ষ্য গুলো কি?
২) সামাজিক আইনের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩) সামাজিক আইনের সংজ্ঞা দাও। (বাংলাদেশে)
৪) সামাজিক আইনের সংজ্ঞা দাও। সংক্ষেপে এর ক্ষেত্রসমূহ আলোচনা কর।

পাঠ- ২ ঃ ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- ☞ মুসলিম পারিবারিক আইন-১৯৬১ এর উল্লেখযোগ্য ধারা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ
- ☞ আইন সম্পর্কে আলোচনা

মুসলিম পারিবারিক আইন-১৯৬১

ভুমিকাঃ বাংলাদেশে মুসলমান নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা প্রদানের প্রণীত হচ্ছে সর্বপ্রথম আইন। এই আইনটি বিশেষ করে মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ, তালাক, ভরণ-পোষণ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি পারিবারিক বিষয়াদি বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য প্রণয়ন করা হয়ে। ১৯৬১ সালের অধ্যাদেশ জারী হওয়ার পূর্বে বিবাহ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যেমন-বহুবিবাহ, তালাক, ভরণ-পোষণ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু অসামঞ্জস্যতা ছিল। ফলে বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশনের কতিপয় সুপারিশ কার্যকরী করণের লক্ষ্যে ১৯৬১ সালে এই অধ্যাদেশ প্রণীত হয়। সময়ের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এই আইনের সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করা হয়েছে।

মুসলিম পারিবারিক আইন-১৯৬১ এর উল্লেখ্যযোগ্য ধারা ও বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

১) এই অধ্যাদেশ ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ নামে অভিহিত।

২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য এমনকি অধ্যাদেশের ১নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের মুসলিম নাগরিকদের উপর এ আইনটি প্রযোজ্য ।

৩) এ অধ্যাদেশ ১৯৬১ সালের ১৪ই জুলাই জারী হয়। অন্য কোন আইন প্রথা বা প্রচলিত রীতি-নীতিতে যাই থাকুক না কেন; এখন থেকে এই আইনের বিষয়সমূহ বলবৎ থাকবে।

৪) মুসলিম পারিবারিক আইনের আওতায় সালিশ পরিষদ বলতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং এই অধ্যাদেশের আওতাভূক্ত কোন বিষয়ের সাথে জড়িত নালিশ প্রদান পক্ষ ও বিপক্ষ সমূহের থেকে ১জন করে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে। তবে শর্ত হলো ও কোন পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিনিধি মনোনিত করতে ব্যর্থ হন সে ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিনিধি ছাড়াই সালিশী পরিষদ গঠিত হবে।

৫) চেয়ারম্যান বলতে ইউনিয়ন পরিষদের বা পৌরসভার চেয়ারম্যান/মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র বা প্রশাসক অথাবা এই অধ্যাদেশ অনুসারে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার চেয়ারম্যান কার্য সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝায়। তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে ইউনিয়ন বা পৌরসভার চেয়ারম্যান অমুসলমান অথাবা তিনি নিজেই সালিশী পরিষদে আবেদন করতে ইচ্ছুক অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে অপারগ, সেক্ষেত্রে অত্র অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য কার্য সম্পাদনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার একজন মুসলমান সদস্যকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়।

৬) মুসলিম আইন অনুসারে প্রতিটি বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। বিবাহ রেজিস্ট্রির উদ্দেশ্য ইউনিয়ন কাউন্সিল এক বা একাধিক ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান করে এবং ব্যক্তি নিকাহ রেজিস্ট্রার বলে গণ্য হয়।

৭) এই আইনে বিবাহকে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একত্রি চুক্তি হিসাবে গণ্য করা হয় এবং বিবাহের বয়স বর্তমানে ছেলেদের ২২বৎসর ও মেয়েদের নূন্যতম ২০বৎসর ধার্য করা হয়।

৮) এই আইনে কোন ব্যক্তির স্ত্রী বেঁচে থাকতে তিনি সালিশী পরিষদের লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পরিবেন না কিংবা অনুমতি ছাড়া সম্পাদিত কোন বিবাহ (১৯৭৪ সালের বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশনকরণ আলোকে) রেজিস্ট্রিকৃত হবে না। যদি কোন ব্যক্তি সালিশী পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে আরেকটি বিবাহের চুক্তি করেন তাহলে তিনি (১) বর্তমান স্ত্রী বা স্ত্রীগণের দেনমোহরের সম্পূর্ণ টাকা তৎক্ষণাত পরিশোধ করিবেন উক্ত টাকা পরিশোধ না করতে পারলে বকেয়া ভূমি রাজস্ব রূপে আদায় যোগ্য হবে এবং (২) অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত হবে এক বৎসর পর্যন্ত অর্থদন্ড কিংবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডীত হবেন।

৯) যদি কোনো স্বামী তালাক দিতে চায় তাহলে এ ক্ষেত্রে ৯০দিনের সময় দিতে হয়। এ সময় চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ প্রদান করতে এবং এককপি তার স্ত্রীকে প্রদান করা হয়। উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর চেয়ারম্যান সালিশী পরিষদের মাধ্যমে ৯০ দিনের ভিতর উভয়ের মিলনের সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন এবং মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ হলে তালাক কার্যকর হবে।

১০) এ আইনের মাধ্যমে যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর ভরণ-পোষনে অসমর্থ হয় বা একাধিক স্ত্রী রাখে তাদের প্রতি সমভাবে প্রতিপালন করতে না পারলে স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ভারণ-পোষন বা সমদৃষ্টির অভিযোগ দাবী করে লিখিতভাবে ইউনিয়ন পরিষদে অভিযোগ উপস্থাপন করতে পারবেন। চেয়ারম্যান সালিশী পরিষদের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করতে পারবেন। ঐ পরিষদ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ভারণ-পোষণ বাবদ প্রদানের জন্য টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে সার্টিফিকেট জারী করতে পারবেন।

১১) মুসলিম পারিবারিক আইনে কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিলে তাঁর পুত্র/কন্যা মারা গেলে মৃত পুত্র/কন্যার আবার সন্তানাদি থাকলে তাহলে সম্পত্তির বন্টনের সময় সম্পত্তির ভাগ পাবে; যা তিনি জীবিত থাকলে পেত অর্থাৎ দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় কারো পিতা মারা গেলে দাদার সম্পত্তির হতে নাতি-নাতনীদের বঞ্চিত করা যাবে না।

১২) দেনমোহর প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে যদি নিকাহ্নামায় বা বিবাহের চুক্তিতে বিস্তারিতভাবে কিছু না থাকে তবে দেনমোহর চাহিবা মাত্র স্ত্রী তা পাবার জন্যে আদায়যোগ্য বলে গণ্য হবে।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের মূল্যায়ন

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ বিবাহ, রেজিস্ট্রি, তালাক ও বিবাহ-বিচ্ছেদ, খোর-পোশ ও দেনমোহর, বহুবিবাহ, উত্তরাধিকারসহ নারী অধিকার ও কল্যাণ বিষয়ক আরো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োজন আইনানুগ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় । এই আইন অবহেলিত নারী জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও ব্যাপক নিরাপত্তা লাভের সুযোগ করে দিয়েছে। নিম্নে এই আইনের উল্লেখ্যযোগ্য কার্যকরি দিকসমূহ হচ্ছে-

১) এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে এদেশের অনেক বিবাহ, তালাক শব্দটি উচ্চারণের মাধ্যমে অযৌক্তিকভাবে শেষ হয়ে যেত এবং তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী লিখিত প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়ে দেনমোহর ও ভরণ-পোষন থেকে বঞ্চিত হয়েছে এ রূপ ক্ষেত্রে আইন বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নারী সমাজের নিরাপত্তা লাভের ব্যবস্থা করেছে।

২) এ আইনে স্বামীর ইচ্ছামত স্ত্রী ত্যাগ করার ও গ্রহন করার উপর নিয়ন্ত্রন আরোপ করে বিবাহ বিচ্ছেদ ও বহুবিবাহকে রোধ করার চেষ্টা করেছে।

৩) এ আইনে বিবাহকে একটি চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করায় স্ত্রীর মতামত স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছে।

৪) ছেলে মেয়েদের বিবাহের বয়স ধার্য্য করে বাল্যবিবাহ রোধ করা হয়েছে।

৫) পারিবারিক ভাঙ্গনকে রোধ করে সুস্থ সমাজে জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৬) উক্ত আইনের আর একটি দিকগুলো এর মাধ্যমে এতিম শিশুদের উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তির মালিকানা স্বীকার করে তাদের নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা করা হয় এবং বিধবা মহিলাদের অনিশ্চিত অবস্থা থেকে আশ্রয় লাভের সুযোগ করে দেওয়া হয়।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের উপযুক্ত কল্যাণকর দিকগুলো থাকা সত্ত্বেও জনগণের অযথা ও দায়িত্বশীলতার অভাবে বাস্তবে তা ততটা কার্যকরি হয়ে উঠেনি। ধর্মীয় অনুভূতি, অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও দারিদ্রতা ইত্যাদির কারণে আইনটির ব্যাপকতর সুবিধা লাভ থেকে নারী সমাজ বঞ্চিত হচ্ছে। আইন সম্পর্কে জনগণের অসচেতনতা ও সরকারের প্রচারের অভাবের কারণে এই আইন লিখিতভাবে যতটা কার্যকর, প্রয়োগিক ক্ষেত্রে ততটা লক্ষ্যণীয় নয় বলে নারীরা এই আইনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এতদ্সত্ত্বেও অদূর ভবিষ্যতে জনগণের সচেতনতা, দায়িত্বশীলতা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে উক্ত আইন আরো ফলদায়ক হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

১) ১৯৬১ সালের "মুসলিম পারিবারিক আইন" এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ/ধারাসমূহ আলোচনা করুন।

২) সমালোচনাসহ ১০৬১ সালের " মুসলিম পারিবারিক আইনটি" আলোচনা করুন।"

পাঠ- ৩ ঃ শিশু আইন ১৯৭৪

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ।

ভূমিকা

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রণীত সামাজিক ও শিশু কল্যাণমূলক আইনের পূর্ণাঙ্গ রূপ হচ্ছে ১৯৭৪ সালের শিশু আইন। শিশুদের হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ, তাদের সাথে ব্যবহার, চিকিৎসা এবং কিশোর অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কে আইন একীভূত ও সংশোধন করে। এত ৭৮টি ধারা বলবৎ।

নিম্নে এই আইনের উল্লেখ্যযোগ্য দিকসমূহ আলোচনা করা হলোঃ

৬.৩ শিশু আইন '১৯৭৪ এর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ/বৈশিষ্ট্যসমূহ/ধারাসমূহ

১) এই আইনে "শিশু হচ্ছে ১৬ বছরের কমবয়স্ক এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হচ্ছে ১৬ বছরের বেশী বয়স্ক।"

২) এই আইনানুযায়ী কোন এলাকার জন্য এক বা একাধিক শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা করা যাবে। সরকারের (ক) হাইকোর্ট ডিভিশন (খ) দায়রা আদালত (গ) অতিরিক্ত দায়রা জজ ও সহকারি দায়রা জজ কোর্ট (ঘ) মহ্কুমা হাকিম (ঙ) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কিশোর আদালত গঠন করার ক্ষমতা রয়েছে।

৩) শিশুকে প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে একত্রে অভিযোগ প্রণয়ন ও বিচার করা যাবে না। নির্দিষ্ট প্রজ্ঞাপন দ্বারা কিশোর আদালত কখন, কোথায় ও কিভাবে বসবে তা প্রচারিত হবে।

৪) কিশোর আদালতে শিশুর পিতা-মাতা, অভিভাবকগণ, আদালতের সদস্যগণ ও কর্মকর্তা, আদালতে উপস্থাপিত অভিযোগের পক্ষগণ, পুলিশ এবং আদালতে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গগণ ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত থাকতে পারবে না ।

৫) আদালত যদি শিশুর স্বার্থে কোন ব্যক্তিবর্গকে অথবা শিশুর পিতা-মাতা অথবা দম্পত্তি অথবা শিশু নিজ সম্মেত কোন ব্যক্তিকে আদালত হতে প্রত্যাহার করা সমীচীন মনে করেন তা হলে আদালত নির্দেশ দিতে পারবেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আদালত ত্যাগ করবে।

৬) মামলার শুনানিতে আদালত প্রয়োজন মনে করলে শিশুকে তার উপস্থিতি থেকে অব্যাহতি দিতে পারে।

৭) বিচারাধীন কোন শিশুর শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে আদালত যতদিন প্রয়োজন ততদিন হাসপাতাল বা অন্য অনুমোদিত স্থানে চিকিৎসার্থে প্রেরণ করতে পারেন।

৮) অভিযুক্ত শিশুর রায় বা আদেশ দেয়ার পূর্বে শিশুর চরিত্র ও বয়স, শিশুর জীবন ধারণের পরিবেশ, পারিবারিক অবস্থা, প্রবেশন কর্মকর্তার প্রতিবেদন ইত্যাদি আদালত বিবেচনা করবেন।

৯) বিচারাধীন কোন শিশুর ছবি বা পরিচয় সংবাদপত্রের প্রকাশ করা যাবে না। তবে শিশুর স্বার্থ ও কল্যাণার্থে অনুমতি সাপেক্ষে প্রতিবেদন প্রকাশ করা যাবে।

১০) অপরাধী শিশুদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধায়ক, অপরাধী আটক রাখা, রোগ নির্ণয়, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত নীতিমালা সন্নিবেশিত হয়েছে।

১১) সরকার প্রত্যেক জেলায় একজন শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন। যারা শিশু পরিদর্শন ও অন্যান্য কর্তব্য পালন করবেন এবং শিশুকে সার্বিক সহযোগিতা দেবেন ও আদালতে প্রতিবেদন দেবেন।

১২) দঃস্থ ও অবহেলিত শিশুর তত্ত্বাবধান ও পালনের জন্য শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা বা কর্ম পক্ষে সাব-ইনস্পেক্টরের পদমর্যাদা সম্পন্ন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

১৩) আদালত দুঃস্থ শিশুর সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় কিশোর হাজত, সংশোধনী প্রতিষ্ঠান কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বাসায় রাখতে পারবে।

১৪) শিশুদের সাথে কেউ যদি নির্দয় ব্যবহার করে জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করেন; নেশা করা ও শিশুকে নেশা করানো ঋণ গ্রহন উৎসাহদান, পতিতালয়ে থাকার অনুমতিদান, অবৈধ যৌন কাজে ব্যবহার করা বা উৎসাহদান,

শিশু কর্মচারীকে শোষণ ও পলায়নে সহায়তা করণ ইত্যাদি কাজের জন্যে উক্ত ব্যক্তির শাস্তি হচ্ছে ৬মাস থেকে ২বছর পর্যন্ত মেয়াদে কারাদন্ড এবং ২০০টাকা থেকে ৫,০০০টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় প্রকার দন্ড।

১৫) কোন শিশু অজামিন যোগ্য অপরাধ করলে বিশেষ ব্যবস্থায় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিন দিতে পারে। তবে অভিযুক্তের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে জামিন মঞ্জুর করবে না। আর জামিন না মঞ্জুর হলে রিমান্ড হোম বা নিরাপদ স্থানে রাখবে।

১৬) অন্য কোন আইনে বিপরীত কিছূ থাকা সত্ত্বেও কোন শিশুকে মৃত্যুদন্ড যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা কারাদন্ড দান করা যাবে না।

১৭) আদালত আটকাদেশ প্রাপ্ত শিশুর অন্যত্র রাখার খরচের জন্য পিতা-মাতা বা অন্য কাউকে নির্দেশ দিতে পারে। এ আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকার যে কোন বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

মূল্যায়ন ঃ শিশু কল্যাণে ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের গুরুত্ব ও অবদান অনস্বীকার্য। শিশুদের সুষ্ঠ বিকাশ ও কল্যাণে এটি তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করেছে। এর আওতায় গাজীপুরের টঙ্গী ও যশোরে কিশোর অপরাধ সংশোধন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইনস্টিটিউটের শাখা গুলো হচ্ছে (ক) কিশোর আদালত (খ) কিশোর হাজত (গ) সংশোধনী প্রতিষ্ঠান। ক্রমবর্ধমান অপরাধ সংশোধনে এসব প্রতিষ্ঠান কার্যকর অবদান রাখছে। তথাপিও বর্তমানে দেশে বিপুল সংখ্যক শিশু অযত্ন, অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। বর্তমানে শিশু অধিকার সনদ, বাংলাদেশের শিশুনীতির প্রেক্ষাপটে এই আইনটির সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়ত রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে শিশুদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য একমাত্র আইনটিতে শিশুদের মৌল মানবিক চাহিদা, বিনোদনমূলক কার্যক্রম ও জনগণের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে তেমন কিছূই উল্লেখ নেই। শিশুদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থার দিকটিও এই আইনে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। কিশোর অপরাধীর সংশোধন এর উপর জোর দিয়েছে আইনটি, কিন্তু কিশোররা বা শিশুরা যে সব পরিস্থিতির কারণে এই অবস্থায় পরিণত হয় বা অপরাধ করে তাঁর নিরাময়ের দিকটি একেবারেই গুরুত্ব পায়নি।

অনুশীলনী

সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্তর/সংক্ষেপে প্রশ্নের উত্তর দেন।

(১) ১৯৭৪সালের শিশু আইনটির উল্লেখযোগ্য ধারাসমূহ/দিকসমূহ আলোচনা করুন।

(২) ১৯৭৪ সালের শিশু আইনটির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ আলোচনা কর। এর সীমাবদ্ধতাগুলি সংক্ষেপে লিখ।

পাঠ- ৪ ঃ যৌতুক বিরোধী আইন-১৯৮০

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

☞ যৌতুক কি, যৌতুকের শাস্তি এবং যৌতুকের জন্যে নারী নির্যাতন ইত্যাদি সম্পর্কে ১৯৮০সালের যৌতুক বিরোধী আইনের ব্যাখ্যা জানতে পারবেন।

৬.৪ ঃ ১৯৮০ সালের যৌতুক বিরোধী আইন

ভূমিকা

বাংলাদেশের বিয়ে অনুষ্ঠানে যৌতুক প্রথার ক্রমবৃদ্ধি ও এর নেতিবাচক প্রভাব পারিবারিক জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। এ যৌতুক প্রথার প্রভাব সমাজ জীবনে দেখা দেয় নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ পারিবারিক ভাঙ্গনসহ নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়ন। এ ধরনের বিশৃংখলার প্রেক্ষাপটে সরকার বিয়ের অনুষ্ঠানে যৌতুক গ্রহন ও প্রদান নিরোধকল্পে যৌতুক বিরোধী আইন-১৯৮০ প্রণয়ন করেন।

১) **সংরক্ষিত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ** এ আইনটি ১৯৮০সালের যৌতুক নিরোধ আইন নামে অভিহিত করা হবে। সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে ইহা কার্যকরি হবে।

২) **সংজ্ঞা ঃ** "যৌতুকের " সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

(ক) বিয়ের এক পক্ষ কৃর্তৃক অপর পক্ষকে অথবা

(খ) বিয়ের কোন এক পক্ষের পিতা-মাতা বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোন পক্ষকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে বিয়ের সময় বা যে কোন সময়ে বিয়ের পণ হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বোঝানো, তবে প্রযোজ্য মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়া মোতাবেক প্রদেয় দেনমোহর বা মোহরানা এর অন্তর্ভূক্ত নয়।

৩) **যৌতুক প্রদান বা গ্রহনের দন্ড ঃ** এ আইন কার্যকর হওয়ার পর কোন ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহন করলে অথবা প্রদান বা গ্রহনে সহায়তা করলে তাঁর পাঁচ বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড (তবে এক বছরের কম হবে না) বা জরিমানা বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

৪) **যৌতুক দাবি করার দন্ড ঃ** এ আইন কার্যকর হওয়ার পর কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষেত্রানুযায়ী কনে বা বরের পিতা-মাতা বা অভিভাবকের কাছে যৌতুক দাবি করলে তিনি (পাঁচ বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড বা এক বছরের কম হবে না) বা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

৫) **যৌতুক প্রদান বা গ্রহনের চুক্তি বাতিল ঃ** এ আইনে যৌতুক প্রদান অথবা গ্রহনের সকল প্রকার চুক্তি বাতিল করা হয়।

৬) **অপরাধসমূহ আমল ঃ** ১৮৯৮সালের ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাই থাকুক না কেন এ আইনের কোন অপরাধ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্নের কোন আদালত বিচার করতে পারবে না। অপরাধ সংগঠনের তারিখ হতে এক বছরের মধ্যে অভিযোগ না থাকলে কোন আদালত এই আইনে কোন অপরাধ আমলে নেয়া হবে না। এ ছাড়া আইনে আমলযোগ্য অপরাধের জন্য অপরাধী ব্যক্তিকে আইনানুযায়ী যে কোন দন্ড প্রদানে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বৈধ ক্ষমতার অধিকারি।

৭) **অপরাধসমূহ আমল অযোগ্য, জামিনযোগ্য ও আপোষ-অযোগ্য ঃ** এ আইনের আওতায় প্রত্যেক অপরাধ আমল অযোগ্য, জামিনযোগ্য ও আপোষ-অযোগ্য।

৮) **বিধি প্রয়োগের ক্ষমতা ঃ** এ আইনের উদ্দেশ্যাবলী কার্যকরণার্থে সরকার, সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিবি প্রণয়ন করতে পারেন। এই ধারার অধীন প্রত্যেকটি বিধি প্রয়োজনের পর পরই সংসদের নিকট পেশ করতে হবে। সংসদের অধিবেশন সমাপ্তির পূর্বেই যদি সংসদ এই মর্মে একমত হন যে, প্রণীত বিধির রদ-বদল প্রয়োজন বা উহা প্রণয়ন সমীচিন নহে, তদানুযায়ী কেবলমাত্র রদ-বদলকৃত বিধি ব্যবস্থা কার্যকরি করা হয় অথবা উহা আদৌ কার্যকরি করা হয় না। তবে শর্ত যে, অনুরূপ রদ-বদলকৃত বা বাতিলকৃত বিধি বলে কোন ব্যবস্থা ইতিপূর্বে গৃহীত হয়ে থাকলে গৃহীত ব্যবস্থার বৈধতা খর্ব হবে না।

আলোচনা ঃ যৌতুক নিরোধ আইন নিঃসন্দেহে এ দেশে নারী অধিকার সংরক্ষণে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং সামাজিক প্রগতি ত্বরান্বিত করার কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে। শিশু বাস্তবে এর যথাযথ প্রয়োগে শিথিলতা ও জনগণের উদাসীনতা থাকায় তা এখনো কার্যকরি হয়ে উঠেনি দুঃখজনকভাবে এই আইনের কার্যকারিতা এখনও সীমিত। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত আইনবিধ গাজী শামসুর রহমান বলেন "নারীকে নিগ্রহ থেকে রক্ষার জন্য বাংলাদেশে যে সব আইন বিদ্যমান সেগুলোর যথার্থ প্রয়োগ হচ্ছে না।" আবার, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় নিগৃহীত নারী আইনের আশ্রয় প্রার্থনা করেন না। আইনের আশ্রয় চাওয়ার পিছনে রয়েছে আবার অনেক সমস্যা; যা হউক আইনের আশ্রয় গ্রহনের জন্যে সচেতনতা, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং জনগণের সহযোগিতার মাধ্যমেই কেবল মাত্র সম্ভব আইনের বাস্ত বায়ন/প্রয়োগ/বর্তমানে নারী নির্যাতন, যৌতুক প্রদান/গ্রহণ, এসিড নিক্ষেপ, নারী অপহরণ,শিশু পাচার ইত্যাদি বিষয়ে পূর্বেকার যতদিন আইন ছিল তাতে যে সব সীমাবদ্ধতা, ত্রুটি ছিল তা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করে নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়ে রচিত হয়েছে ২০০০ সালের 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন'। আশা করা যায়, উক্ত আইন যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই নারী শিশু নির্যাতন নিরসন করা সম্ভবপর হবে।

পাঠ- ৫ ঃ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এর উল্লেখ্যযোগ্য দিকসমূহ ও ধারাসমূহ।

ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে নারী সমাজের স্বার্থ সংরক্ষণ অধিকার আদায় ও কল্যাণে পারিবারিক আদালত এক যুগান্তরকারি পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে বিবাহিত নারী তার হারানো মর্যাদা ও অধিকার ফিরে পায় এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়। ১৯৮৫সালের ১৭ই মার্চ প্রবর্তিত হয় পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ। নিম্নে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ'১৯৮৫ এর উল্লেখযোগ্য দিকগুলো আলোচনা করা হলোঃ

১) **প্রতিষ্ঠা ও আদালত স্থাপন ঃ** এ অর্ডিন্যান্স ১৯৮৫সালের পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স নামে অভিহিত। এই অধ্যাদেশ রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য এলাকার জেলা সমূহ ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য। পারিবারিক আদালত বলতে এ অর্ডিন্যান্সের অধীনে গঠিত পারিবারিক আদালতকে বুঝায়। যতগুলো মনসেফ আদালত রয়েছে সবগুলোই আদালত পারিবারিক আদালত হিসেবে গন্য হবে। মনসেফগণই পারিবারিক আদালতের বিচারক হবে।

২) **আদালতের এখতিয়ার ঃ** ১৯৬১সালের মুসলিম পারিবারিক অর্ডিন্যান্স এর বিধানাবলী সাপেক্ষে পারিবারিক আদালতের নিম্নলিখিত বিষয় হতে উদ্ভূত বা সম্পর্কিত যে কোন মামলা গ্রহন বিচারকার্য সম্পাদান ও মামলা নিস্পত্তি করতে পারবেন-

- বিবাহ বিচ্ছেদ
- দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার
- মোহরানা
- ভরণ-পোষণ
- অভিভাবকত্ব ও শিশুদের তত্ত্বাবধান

৩) **মামলা দায়েরকরণ ঃ** ২৫টাকা কোর্ট ফি দিয়ে মামলা রুজু করা যাবে। মামলা করার এখতিয়ারভূক্ত বিষয় হচ্ছে

ক) নালিশের কারণ সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপে সৃষ্টি হয়েছে।
খ) উভয়পক্ষে একসাথে বসবাস করে বা পূর্বে বসবাস করে ছিলেন।

৪) **সমন ও নোটিশ জারিকরণ ঃ** পারিবারিক আদালতে কোন আরজি পেশ করা হলে আদালত
ক) বিবাদীকে হাজির হবার জন্য একটা তারিখ নির্ধারণ করেন যা সাধারণভাবে ৩০দিনের বেশি হয় না।
খ) নির্দিষ্ট তারিখে বিবাদিকে আদালতে হাজির হয়ে দাবি সম্পর্কে জবাবদান করবার জন্য সমন জারি করেন।
গ) প্রাপ্তি স্বীকার পত্রসহ বেজিস্ট্রার্ড পোস্টে বিবাদীকে মামলার নোটিশ প্রদান।

৫) **লিখিত জবাব**

(ক) নির্দিষ্টি তারিখে বিবাদীর হাজির হবার সময় বাদী ও বিবাদী উভয়ই আদালতে উপস্থিত থাববেন এবং বিবাদী তার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য হাজির করা এমন সাক্ষীদের নাম ও ঠিকানাসহ তফসিল সংযুক্ত করতে হয়।

৬) **অুপস্থিতির ফলাফল ঃ** নির্দিষ্ট দিনে মামলা শুনানীর সময় কোন পক্ষ উপস্থিত না থাকলে আদালত মামলাটি খারিজ করে দিতে পারেন। অন্যদিকে মামলা শুনানীর সময় বাদী হাজির হলে এবং বিবাদী হাজির না হলে তাহলে আদালত একতরফাভাবে মামলা চালাতে পারেন।

৭) **পূর্ব বিচার পরিচালনা ঃ** (১) লিখিত বিবৃতি পেশ করার পর পারিবারিক আদালত মামলার পূর্ব বিচার শুনানির জন্য একটা তারিখ ধার্য করেন যা সাধারণভাবে ৩০দিনের বেশি হয় না। (২) পূর্ব বিচার শুনানির দিনে আদালত উভয়পক্ষ কর্তৃক পেশাকৃত আরজি; লিখিত বিবৃতি এবং সাক্ষ্যের সংরক্ষিত বিবরণ ও দলিল পত্রাদি পরীক্ষা -নিরীক্ষা করেন এবং আদালত যথাযথ মনে করলে উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করেন। (৩) পূর্ব বিচার শুনানির সময় আদালত উভয়

পক্ষের মধ্যেকার বিবাদমান বিষয়গুলো নির্ধারণ করেন এবং সম্ভব হলে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা বা মীমাংসার চেষ্টা করেন।

৮) **গোপন বিচার**

ক) পারিবারিক আদালত যথার্থ মনে করলে অধ্যাদেশের আওতায় সমগ্র মামলা বা এর অংশ বিশেষ গোপনে পরিচালনা করতে পারেন।

খ) মামলার উভয়পক্ষে আদালতকে গোপনে মামলা পরিচালনার অনুরোধ করলে আদালত তা করতে পারেন।

৯) **সাক্ষ্য রেকর্ড ভূক্তকরণ** ঃ নির্ধারিত তারিখে আদালত যেভাবে উপযুক্ত মনে করবেন; সে ক্রমানুসারে মামলার উভয় পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহন করবেন।

১০) **বিচার সমাপ্তি** ঃ (১) উভয়পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্তির পর পারিবারিক আদালত উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতা বা মীমাংসা করার জন্য আর একবার উদ্যোগ গ্রহন করবেন। (২) এ ধরণের কোন মীমাংসা বা সমঝোতা সম্ভব না হলে আদালতরায় ঘোষণা করেন এবং রায় ঘোষণার পর ডিক্রিজারি করা হয়।

১১) **সমঝোতামূলক ডিক্রি** ঃ সমঝোতা বা মীমাংসার মাধ্যমে কোন বিরোধের সমাপ্তি হলে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোত বা মীমাংসার আলোকে আদালত মামলা ডিক্রিজারি করেন বা সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

১২) **রায় লিপিবদ্ধকরণ** ঃ প্রতিটি রায় বা আদেশ বিচারকের শ্রুতিলিপি থেকে আদালতের ভাষায় লিখতে হবে এবং তা প্রকাশ্যে ঘোষণার পর বিচারক তাতে স্বাক্ষর ও তারিখ দেবেন।

১৩) **ডিক্রি বলবৎকরণ** ঃ ডিক্রির দায় পরিশোধ আদালতের উপস্থিতিতে নগদ অর্থ বা সম্পত্তি হলে রেজিস্ট্রার প্রদান বা হস্তান্তরের বিষয় লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৪) **আপিল** ঃ পারিবারিক আদালতের রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আপিল করা যাবে।

১৫) **সাক্ষীদের সমনের ক্ষমতা** ঃ আদালত কোন ব্যক্তিকে হাজিরের সাক্ষ্যের বা দলিল দাখিলের সমন ইস্যু করতে পারে।

১৬) **পারিবারিক আদালত অবমাননা** ঃ কোন বৈধকরণ ব্যতিত কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কারণে পারিবারিক আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়-

ক) পারিবারিক আদালতের প্রতি অপমান প্রদর্শন করলে;

খ) পারিবারিক আদালতের কাজে বাঁধার সৃষ্টি করলে;

গ) পারিবারিক আদালত কর্তৃক জিজ্ঞাসিত কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করলে;

ঘ) সত্য না বলতে চাইলে বা আদালত কর্তৃক কোন বিবৃতিতে স্বাক্ষর না করলে এই ধরণের আদালত অবমাননার জন্যে পারিবারিক আদালত তৎক্ষণাৎ বিচার করতে পারেন ও ২০০টাকা জরিমানা করতে পারেন।

১৭) **প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হওয়া** ঃ এ অধ্যাদেশের অধীনে সাক্ষী ছাড়া অন্য কোন লোককে পারিবারিক আদালতে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়লে এবং তিনি যদি একজন পর্দানশীল মহিলা হন তাহলে আদালত তাকে তার ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধিকে প্রতিনিধিত্ব করবার অনুমতি দিতে পারেন।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ সরকার সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে এই অধ্যাদেশের কার্যকরি করার জন্য বিধি প্রণয়ন করতে পারেন।

আলোচনা ঃ মুসলিম পারিবারিক আইনের সুফল ভোগের নিশ্চিয়তাকালে বিবাহ বিচ্ছেদ, দাম্পত্য অধিকার, পুনরুদ্ধার, দেনমোহরানা, খোরপোষ, উত্তরাধিকার, সন্তান সম্পত্তির অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত বিষয়াদির মামলা গ্রহন, বিচারকার্য ও নিস্পত্তির জন্য সাধারণ আদালতের বাইরে পৃথক কার্যক্রমের আওতায় পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এ আইনটির মাধ্যমে নারী সমাজ আইনের আশ্রয় নিতে সহজে পারছে; তাতে কোন ধরনের হয়রানির স্বীকার হতে হচ্ছে না। বিচারকার্য দ্রুত নিস্পত্তি ও ন্যার্য বিচার লাভের সুযোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এই আদালতের অবদান অস্বীকার্য। দাম্পত্য বিষয়ক পারিবারিক জটিলতা নিরসনে এখন আর সমাজের কর্তা ব্যক্তিটির নিকট যেতে হয় না। এ সবই পারিবারিক আদালতের সুফল। কিন্তু এই আদালতের প্রক্রিয়ায় কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ লিখিত বিবৃতি পেশকৃত আরজি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পারিবারিক দীর্ঘ জটিলতা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সমাধান দিতে পারে না। পারিবারিক জীবনের জটিলতা মীমাংসা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যা কোন বিচারকের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে সমস্যার সমাধান দেয়া

খুব সহজ সাধ্য নয়। তাছাড়া এই আদালতের আরো কার্যকরি করে তুলতে হলে গ্রামীণ নারী সমাজকে সচেতন করে তুলতে হবে।

অনুশীলনী

সম্ভাব্য প্রশ্নসমূহ

১) পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ’এর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ আলোচনা করুন।

২) সমালোচনাসহ বাংলাদেশের ’১৯৮৫সালের ‘পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ’ আইনটি আলোচনা করুন।

পাঠ- ৬ ঃ নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন '২০০০

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন '২০০০ এর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ-

ভূমিকা

ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন অসহনীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের ভয়াবহতা যেন দিন দিন বেড়েই চলছে। এমতাবস্থায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক এ আইনটি প্রণীত হয়েছে। সমাজ এবং রাষ্ট্রের আগামী কর্ণধর হচ্ছে- শিশু সমাজ । সে কারণে শিশুদের নির্যাতন হতে রক্ষা করা এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতন সমাজের স্তরে স্তরে সীমাহীনভাবে বেড়ে যাবার ফলশ্রুতিতে এটি রোধকল্পে বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার কর্তৃক এ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়; যার কারণে সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন '২০০০ প্রণয়ন করেন।

৬.৬ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন '২০০০ এর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহঃ

১) **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও সংজ্ঞা** ঃ এই আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন '২০০০ নামে অভিহিত হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০০০ সালের বাংলাদেশ গেজেটে অতিরিক্ত প্রজ্ঞাপন দ্বারা সর্ব সাধারনের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। এই আইনে

(ক) "অপহরণ" অর্থ বলপ্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করে বা ফুসলিয়ে বা ভূল বুঝিয়ে বা ভীতি প্রদর্শন করে কোন স্থান হতে কোন ব্যক্তিকে অন্যত্র যেতে বাধ্য করা

(খ) "আটক" অর্থ কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকিয়ে রাখা ।

(গ) "নবজাতক শিশু" অর্থ ৪০দিন অনুর্ধ্ব বয়সের কোন শিশু ;

(ঘ) "নারী" অর্থ কোন বয়সের নারী ;

(ঙ) "মুক্তি পণ" অর্থ আটক সুবিধা বা অন্য যে কোন প্রকারের সুবিধা ;

(ঙ) "ধর্ষণ" অর্থ পেনাল কোড; ১৮৬০ (অপঃ ঢখঠ ড়ভ ১৮৬০) এর ঝবপঃরড়হ ৩৭৫ ঐ সংজ্ঞায়িত জধঢ়ব.

(ছ) "শিশু" অর্থ অনধিক ১৪বছর বয়সের কোন ব্যক্তি;

(জ) "যৌতুক" অর্থ কোন বিবাহের কণে পক্ষ কর্তৃক বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা বর পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্কে বিদ্যমান থাকাকালে ব্বিাহ স্থির থাকার শর্তে বা বিবাহের পণ হিসেবে প্রদত্ত অথবা প্রদানে সম্মত অর্থ সামগ্রী বা অন্যদিক সম্পর্ক এবং উক্ত শর্ত বা পণ হিসেবে উক্ত বর বা বরের পিতা-মাতা বরের পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক কনে বা কনে পক্ষের কোন ব্যক্তির নিকট দাবীকৃত অর্থ সামগ্রী বা সম্পদ।

২) **আইনের প্রাধান্য** ঃ আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনটির বিধানবলী কার্যকর হবে।

৩) **দহনকারী ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি** ঃ যদি কোন ব্যক্তি দহনকারি , ক্ষয়কারি অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন; তাহলে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যূদন্ডে বা যাবৎজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অনুধ্ব ১লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে ও দন্ডনীয় হবেন। যদি কোন ব্যক্তির উপরোক্ত বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা শরীরের কোন অংগ গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার বা শরীরের কোন স্থানে আঘাত পাওয়ার ক্ষেত্রে তাহলে তার শাস্তি হবে অনধিক ১৪বছর কিন্তু অন্যুন ৭বছরের সশ্রম কারাদন্ডের কম নয় ও অতিরিক্ত ৫০,০০০/= টাকা জরিমানা হবে।

৪) **নারী পাচার, ইত্যাদির শাস্তি** ঃ যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতিবিঘ্নত কোন কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বিদেশে হতে আনয়ন করেন বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা ক্রয়ে বা বিক্রয় করেন বা কোন নারীকে ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তানন্ত্র করেন বা অনুরুপ কোন উদ্দেশ্যে কোন নারীকে দখলে, জিম্মি বা হেফাজতে রাখেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃতুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা অনধিক

বিশ বৎসর বা অনূন্য দশ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন। আবার কোন পতীতালয়ের রক্ষনাবেক্ষনকারী বা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তি নাড়ীকে ক্রয় বা ভাড়া করনে বা অন্য কোন ভাবে নাড়ীকে দখলে নেন বা জিম্মায় রাখেন এবং তা প্রমানিত হলে অনুরূপ দন্ডে দন্ডনীয় হবেন (উপরে উল্লেখিত)।

৫) **শিশু পাচার, ইত্যাদির শাস্তি ঃ** যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনি বা নীতিবিগর্হিত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে বিদেশ হতে আনায়ন করেন বা বিদেশে প্রেরণ করেন বা পাচার করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা উক্তরূপ কোন উদ্দেশ্যে শিশুকে নিজ দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হবেন। নবজাতক শিশুকে হাসপাতাল/ মাতৃসদন/ নার্সিং হোম/ ক্লিনিক ইত্যাদি হতে চুরি করেন তাহলে উক্ত ব্যক্তি উল্লেখিত দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

৬) **নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি ঃ** যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৫-এ উল্লেখিত কোন অপরাধ সংঘঠনের উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে অপহরন করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা অনূন্য চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

৭) **মূক্তিপণ আদায়ের শাস্তি ঃ** যদি কোন ব্যক্তি মূক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে আটক করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

৮) **ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, ইত্যাদির শাস্তি ঃ** যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন তাহলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

৯) **যৌনপীড়ন ইত্যাদির শাস্তি ঃ** কোন পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চারিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন তাহলে তার এই কাজ হবে যৌন পীড়ন। তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক দশ বৎসর কিন্তু নূন্যতম ৩ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন। কোন নারীর শ্লীলতাহানি করলে বা অশোভন অঙ্গ-ভঙ্গি করলে তার এই কাজ হবে যৌন হয়রানি এবং তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক সাত বৎসর অথবা অন্যূতম: ২ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন।

১০) **যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, ইত্যাদির শাস্তি ঃ** যদি কোন নারীর স্বামী বা স্বামীর পিতা-মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, উক্ত নারীকে আহত করেন বা চেষ্টা করেন তাহলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা-মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি:-

ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদন্ড বা চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং উভয়ক্ষেত্রে দন্ডের অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন:

খ) আহত করার জন্যে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে বা আহত করার চেষ্টার জন্যে অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অন্যূনত পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ও অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন:

গ) ভিক্ষাবৃত্তি, ইত্যাদির উদ্দেশ্যে শিশুকে অঙ্গহানীর শাস্তি যদি কোন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন শিশুর হাত, পা, চক্ষু বা অন্য কোন অঙ্গ বিনষ্ট করেন বা অন্য কোনভাবে বিকলাঙ্গ বা বিকৃত করেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

১১) ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, ধর্ষণের কারণে কোন সন্তান জন্ম লাভ করলে ক) উক্ত সন্তানের ভরণ-পোষনের দায়িত্ব ধর্ষণকারী পালন করবেন খ) সন্তানটি তার (ধর্ষিতার) তত্বাবধানে থাকবে। কন্যা সন্তানের বিবাহ পর্যন্ত এবং ছেলে সন্তানের ২১ বৎসর এবং পঙ্গু সন্তানের বেলায় উপার্জক্ষম না হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষনের খরচ আদালত নির্ধারণ করবেন।

১২) **নির্যাতিত নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধা নিষেধ ঃ** নির্যাতিত নারীর বা শিশুর সংবাদ পত্রিকায় এমন ভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাবে যাতে উক্ত নারীর বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়। উক্ত বিধি লংঘন হলে ২ বৎসরের কারাদন্ড সহ ১ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

১৩) **অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি ঃ** এই আইনের অধীনে কোন অর্থদন্ড আরোপ করা হলে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অপরাধীর স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয়বিধ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতক্রমে ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় বা ক্রোক ছাড়াই সরাসরি নিলামে বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রাইবুন্যালে জমা দিবার নির্দেশ প্রদান করবেন।

১৪) **মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের ইত্যাদির শাস্তি ঃ** যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অন্য কোন ধারার অধীনে মামলা বা অভিযোগ দায়ের করার জন্য নায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জেনেও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান তাহলে মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি এবং যিনি অভিযোগ করিয়েছেন উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত দন্ডেও দন্ডনীয় হবেন।

১৫) **অপরাধের তদন্ত, বিচার পদ্ধতি আসামীর অনুপস্থিতি বিচার ঃ** এই আইনের অধীনে অপরাধের তদন্ত সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার কর্তৃক অপরাধটি সংঘটনের তথ্য প্রাপ্তি অথবা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ তদন্তের আদেশ প্রদানের পরবর্তী ৬০দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে, যদি ন্যায় বিচারের স্বার্থে তদন্তের সময় সীমা ট্রাইব্যুনাল ৩০ (অনধিক) দিন বর্ধিত করতে পারবে। এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের বিচার কেবল মাত্র গঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হবে। মামলার শুনানী শুরু হলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি কর্মদিবস একটানা চলবে। ১৮০দিনের মধ্যে মামলার বিচার কার্য সমাপ্ত করতে হবে। যদি ট্রাইবুন্যাল এই মর্মে বিশ্বাস করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেফতার বা বিচারের ভয়ে পলাতক/আত্মগোপন করেছেন অথবা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যামিনে মুক্তি দেয়ার পর পলাতক হন তাহলে সেক্ষেত্র ট্রাইব্যুনাল কারন লিপিবদ্ধ করে, অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার বিচার কার্য সম্পন্ন করতে পারবে।

১৬) **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ঃ** এই আইনের অধীনে অপরাধ বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলা সদরে একটি ট্রাইব্যুনাল থাকবে এবং প্রয়োজনে সরকার উক্ত জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারবে, এরুপ ট্রাইব্যুনাল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত হবে। ১ জন বিচারকের সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবে।

১৭) **আপীল ও মৃত্যুদন্ড অনুমোদন ঃ** ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ রায় বা আরোপিত দন্ড দ্বারা সংযুক্ত পক্ষ উক্ত আদেশ, রায় বা দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হতে ষাট দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করতে পারবেন। হাইকোর্ট ব্যতীত এই আইনের অধীনে কোন মৃত্যুদন্ড কার্যকর হবেনা।

১৮) **নিরাপত্তামুলক হেফাজত ঃ** এই আইনের অধিনে কোন অপরাধ বিচার চলাকালে যদি ট্রাইব্যুনাল মনে করে যে, কোন নারী বা শিশুকে নিরাপত্তা মূলক হেফাজতে রাখা প্রয়োজন তাহলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত নারী বা শিশুকে কারাগারের বাইরে ও সরকার কর্তৃক এতদ্ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থানে সরকার কর্তৃপক্ষের হেফাজতে বা ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় যথাযথ অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থার হেফাজতে রাখবার নির্দেশ দিতে পারবে।

১৯) **ধর্ষিতা নারী ও শিশুর মেডিকেল পরীক্ষা ঃ** ধর্ষিতা নারী ও শিশুর মেডিকেল পরীক্ষার ক্ষেত্রে, ধর্ষণ সংঘটিত হবার পর যত শীঘ্রই সম্ভব তা সম্পন্ন করতে হবে। যদি কোন চিকিৎসক এক্ষেত্রে অবহেলা করেন তাহলে তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিতে পারেন।

২০) **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ** সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপণ দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

আলোচনা ঃ পূর্বেকার বলবৎ সকল নারী ও শিশু নির্যাতন আইনগুলোর অপর্যাপ্ততা, অসম্পূর্ণতা ও ব্যর্থতার কারনে সরকার আইনগুলোর সংস্কার ও কার্যকরী করার জন্য ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রনয়ন করেছেন। কারণ শিশু ও নারী নির্যাতনের সংশ্লিষ্ট আইনগুলোতে শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ, পাচার ইত্যাদিও বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। এসিড নিক্ষেপের শাস্তি, আলাদা আদালতের ব্যবস্থা, তদন্তের বিশেষ কোন পদ্ধতির কথা বলা হয়নি। এসব কারণে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নতুনভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন। এই দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায় যে, পূর্বেকার বলবৎ আইনগুলির তুলনায় এই আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের ক্ষেত্রে কার্যকর ও বাস্তবসম্মত কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। বিশেষ করে সময়সীমা নির্ধারণ, ভিন্ন আদালত গঠন ও বিচারক নির্ধারণ, নির্যাতনের ক্ষেত্রগুলি স্পষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ আইনকে অনেক খানি সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনের যে জটিলতা দীর্ঘ সূত্রীতা রয়েছে তার থেকে এই আইন মুক্ত নয়। এই আইনের বাস্তবায়নের উল্লেখযোগ্য অসুবিধাসমুহ হচ্ছেঃ-

১। এই আইনে দেখা গিয়েছে প্রত্যেকটি অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তিও বিধান অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে পূর্বেকার আইনের তুলনায় কিন্ত শাস্তির বিধান যদি বেশী কঠোর হয় সেক্ষেত্রে একজন বিচারক বিচার প্রক্রিয়া তত জটিল হয়। কারন

বিচারক যথেষ্ট প্রমান তথ্যাদি না পেলে কাউকে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিবেন না। তাই আইনের সংশোধনের জন্য শাস্তির মেয়াদ/পরিমান বৃদ্ধি না করে বরং শাস্তির প্রাপ্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য শাস্তির মেয়াদ, দন্ড বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

২। আমাদের দেশের মামলা দায়ের, মামলার তদন্ত, সাক্ষ্য গ্রহন, চার্জশীট রির্পোট তৈরি অপরাধীকে আটক করাসহ সকল কাজ পুলিশের উপর ন্যস্ত থাকে। পুলিশ বাহিনীর নূন্যতম জবাব দিহিতার সংস্কৃতি না থাকার কারণে অনেক সময় অর্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাজগুলির ব্যাপারে উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়।

৩। ধর্ষণের সাথে সাথে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাম্য এলাকায় কোন ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত সরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক নেই। তাছাড়া পুলিশ সময়মত ডাক্তারি পরীক্ষা সমপন্ন করায় না।

৪। গ্রামে গঞ্জের নারীরা নির্যাতিত হলে মামলা গ্রহন করা হয় বা মামলা করা হয় অনেক দেরিতে ফলে মামলার আলামত নষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মামলা গ্রহন করতে পুলিশ গড়িমসি করে, অন্য দিকে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভয়ে গ্রামে ভিক্টিমরা মামলা দায়ের করতে পারে না বা হয়রানির স্বীকার হয়ে থাকে।

৫। এই আইনে ৯০ দিনের আগে আসামিকে জামিন না দেওয়া বিধান থাকায় অনেক মিথ্যা (ধর্ষণ নির্যাতন) মামলায় নির্দোষ ব্যক্তি কারাবাসের স্বীকার হচ্ছেন।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর (সম্ভাব্য প্রশ্ন)

১। ২০০০সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনটির উল্লেখ যোগ্য দিকগুলি আলোচনা করুন।

২। ২০০০সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনটির শিশু নির্যাতনের ক্ষেত্রে অথবা নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ গুলি আলোচনা করুন।

৩। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত শিশুকল্যাণ কর্মসূচির বিবরণ বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৭ ঃ ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন (নির্যাতন শাস্তি অধ্যাদেশ)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

☞ নারী নির্যাতন (নির্যাতক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩সালের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ:

৬.৪ ১৯৮০ সালের যৌতুক বিরোধী আইন

ভুমিকা

নারীদের প্রতি নৃশংস আচরণের প্রতিরোধে মূলতঃ শাস্তির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাদেশ। বর্তমান সময়ে নারী নির্যাতন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিন কোন না কোন নারী , কোন না কোনভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। নারী নির্যাতন বন্ধের নানারকম উপায়ের মধ্যে নারী নির্যাতন কারীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ এটি অন্যতম আইন। অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে নারী নির্যাতন রোধকল্পে ১৯৮৩সালে প্রণীত এ অধ্যাদেশে বাংলাদেশ দন্ডবিধির মতোই একটা বাস্ত বভিত্তিক আইন। এ অধ্যাদেশের ধারা ও উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১) **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ ঃ** এ অধ্যাদেশ ১৯৮৩সালের মহিলাদের প্রতি নৃশংস আচনণ বা নারী নির্যাতন (নিবর্তন শাস্তি) অধ্যাদেশ নামে অভিহিত। বাংলাদেশের নাগরিক যে যেখানেই বসবাস করুক না কেন, তাদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য।

২) **অন্য সকল আইনের চেয়ে এ আইনের প্রাধান্য ঃ** বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনের যে কোন বিধান থাকলেও এ অধ্যাদেশের বিধানসমূহ কার্যকরি।

৩) **সংজ্ঞা ঃ** এ অধ্যাদেশে যে শব্দ ও অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হয়েছে তা দন্ডবিধিতে (১৮৬০ সালের ৪৫নং আইন) উল্লেখিত অর্থের অনুরূপ।

৪) **বেআইনি বা অনৈতিক উদ্দেশ্য নারী অপহরণ বা অপহরণের জন্য দন্ড ঃ** বাংলাদেশ দন্ডবিধির ৩৬০-৩৬৯ ধারায় অপহরণ(কিডন্যাপ) বা অপহরণ এর জন্য বিভিন্ন মেয়েদের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এ ধারাগুলিতে যে সকল উদ্দেশ্য আওতায়ভূক্ত নয়, যেমন-বেশ্যাবৃত্তি, বেআইনি বা অনৈতিক কর্ম বা নারীকে যৌন সংসর্গে বাধ্য করা প্রভৃতি উদ্দেশ্য এই ৪ধারায় বিধান রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অপরাধী যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা ১৪বছর পর্যন্ত গ্রহনযোগ্য মেয়াদে সশ্রম করাবাসে শাস্তিযোগ্য হবে এবং জরিমানা যোগ্যও হবে।

৫) **নারী ব্যবস্থা চালানোর জন্য দন্ড ঃ** বাংলাদেশে বেশ্যাবৃত্তিরোধ করে নারী জাতির মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা এ ধারার অন্যতম উদ্দেশ্য। নারীকে পন্য হিসাবে ব্যবহার করে বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে একটি ঘৃণ্য পেশা এ দেশে দীর্ঘদিন ধরে আছে। ফলে একদিকে যেমন নারী জাতির মর্যাদার চরম হানি ঘটছে, অন্যদিকে প্রতিক্ষণে নারী জাতির নিরাপত্তও বিঘ্নিত হচ্ছে। এ অধ্যাদেশ দ্বারা বাংলাদেশে প্রচলিত এ সম্পর্কিত আইনের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেশ্যালয় রাখা বা সংরক্ষণ নিষিদ্ধ করা না হলেও এর উপর এ ধারার মাধ্যমে কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে যে, যে কেউ যে কোন বয়সের নারীকে যদি বেশ্যাবৃত্তি বা কোন ব্যক্তির সাথে নিষিদ্ধ যৌন সঙ্গমের উদ্দেশ্যে বা কোন বেআইনি ও অনৈতিক উদ্দেশ্য আমদানি বা রফতানি বা বিক্রি করে , ভাড়া দেয় বা অন্যভাবে হস্তান্তর করে তবে ঐ ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ১৪বছর পর্যন্ত বর্ধনযোগ্য সশ্রম কারাবাসে শাস্তিযোগ্য হবেও এবং অর্থে দন্ডেও দন্ডনীয় হবে।

৬) **যৌতুকের দরুণ মৃত্যু ইত্যাদি ঘটানোর জন্য দন্ড ঃ** এটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা। বাংলাদেশে যৌতুকের কারণে দিন দিন অসংখ্য নারীকে মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে অথবা নির্যাতিত হতে হচ্ছে। এই ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিয়ের পর স্বামী যদি তার স্ত্রীকে যৌতুক আদায়ের জন্য হত্যা করে বা হত্যার চেষ্টা করে বা গুরুতর আঘাত করে তবে সেই স্বামী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যাবৎজীবন কারাদন্ড বা ১৪ বছর সশ্রম করাবাসে শাস্তিযোগ্য হবে এবং জরিমানাসহ শাস্তি হবে।

৭) **নৈতিকতাবিহীন কাজ ঃ** এ অধ্যাদেশে যে কোন বয়সের নারীকে কোন নৈতিকতাবিহীন কাজ, দেহ ব্যবসা, অবৈধ যৌন সংসর্গ সৃষ্টি বা অনুরূপ কোন কাজে ব্যবহার উদ্দেশ্যে বা ব্যবহৃত হতে পারে জেনে আমদানী-রপ্তানী, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়ায় দান বিংবা ভাড়া হওয়া কিংবা হস্তান্তর করণে অপরাধকে যাবৎজ্জীবন কারাদন্ড অথবা ১৪বছর সশ্রম কারাদন্ড ও জরিমানা হবে।

৮) **ধর্ষণ করতে গিয়ে মৃত্যু সংঘটনের চেষ্টা বা জখম করলে ঃ** এ আইন অনুসারে ধর্ষণ কাজে বা ধর্ষণের প্রচেষ্টাকালে বা ধর্ষণের পরে কোন নারীর মৃত্যু ঘটলে বা খুন হলে অপরাধীকে মৃত্যুদন্ড বা যাবৎজ্জীবন কারাদন্ড বা জরিমানার ব্যবস্থা নেয়া হয়। আর ধর্ষণ ও ধর্ষণের উদ্যোগকালে কোন নারীর গুরুতর জখম বা মৃত্যু ঘটানোর প্রচেষ্টা করলে অপরাধীকে যাবৎজ্জীবন কারাদন্ড বা ১৪বছরের সশ্রম কারাদন্ডে ও জরিমানাদন্ডে দন্ডিত করার ব্যবস্থা করা হবে।

আলোচনা ঃ নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে এ অধ্যাদেশটি নিঃসন্দেহে নারী অধিকার রক্ষা করে ক্রমান্বয়ে যেভাবে দেশে নারীরা নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌতুকের বলি, অপহরণ বা প্রতারণা স্বীকার হতে ছিল সেক্ষেত্রে নারীদের নিরাপত্তা বিধানে এ অধ্যাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল। তাছাড়া বেশ্যাবৃত্তির উদ্দেশ্যে ভাড়া করা নিয়োগ করা অথবা অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করা ইত্যাদির অপরাধের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল একটি সময়ের দাবী। এ কারণেই এই অধ্যাদেশ নৈতিকতা বিবর্জিত ও কলূষিত মুক্ত সমাজ গঠনে সহায়ক। বাস্তবে এ আইনের কার্যকারিতা এখনো জোরদার হয়ে উঠেনি। এ আইনে দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে সত্য কিন্তু এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পুর্ণাঙ্গ আইন নয়। এ আইনের অপর্যাপ্ততা অপূর্ণাঙ্গতার ফলে আইনটি প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা যায়নি। সুতরাং আইন যতো কঠোর কঠিনই হোক না কেন তা যদি বাস্তবায়িত না করার উদ্যোগ না গ্রহন করা হয় তাহলে আইন তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। ফলশ্রুতিতে এখনও পর্যন্ত দেশে, বিদেশে নারী পাচার, নারী ব্যবসা, অপহরণ, ধর্ষণ, ফতোয়া, এসিড নিক্ষেপ এসব ঘটনা প্রতিদিনই অহরহ ঘটছে। এ ছাড়া এ আইনে শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ, পাচার ইত্যাদির গুরুতর অপরাধের বিষয়ে কোন ধারা রাখা হয়নি এ আইনে এসিড নিক্ষেপের শাস্তি আলাদা, পৃথক আদালতের ব্যবস্থা, তদন্তের বিশেষ কোন পদ্ধতির কথা বলা হয়নি।